সদানন্দ বুঝতে পারছে, অমৃতা যতই স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করুক, ভিতরে ভিতরে বেশ অগোছালো হয়ে পড়েছে। না হলে কোন কালের এক ঘনিষ্ঠ মানুষের মরা-মুখ দেখার জন্য এতদূর ছুটে আসে! মনের জোর ফেরাতে ওর পাশে থাকা দরকার।

গাড়ি স্টার্ট দিতেই সদানন্দ শুধোল, যাচ্ছি কোথায়?

- কোথায় আবার! বিশলাখি।

- আমি তো তৈরি হয়ে আসিনি।

গাড়ির কাচ নামিয়ে বাইরে কী যেন দেখে নিয়ে অমৃতা বলল, কিচ্ছু দরকার নেই, চলো তো!

বাড়িতে পৌঁছেও দু'জনের মুখে বিশেষ কথা নেই। কেমন যেন হতভম্ব হয়ে পড়েছে ঘটনার আকস্মিকতায়। সদানন্দ এ সময় সঙ্গে না থাকলে অমৃতা হয়তো ভেঙেই পড়ত। যে মানুষটার খোঁজ ছিল না উনিশ বছর, তাকে দেখে এল লাশকাটা ঘরে। একেবারে মার্ডার!

অমৃতার মোহ কেটে গিয়েছিল কবেই। যৌবনের উন্মাদনায় একটা ভুল করে ফেলে আফশোসও পরে কম হয়নি। অমৃতার মনে পড়ছে, মানুষটা ছিল বড় নরম, কিন্তু রহস্যময়। তার অতীত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে হেসে উড়িয়ে দিত। ও বারবার খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শুধু জানতে পেরেছিল, খুব ছোটবেলায় বাবা মা-কে হারিয়ে ওপার থেকে এপার বাংলায় চলে আসতে হয়েছিল। ব্যস, আর কিছু জানা যায়নি।

সদানন্দকেও সে পুরোনো পরিচয় কিছু দিতে চাইত না। কেন যে দ্বীপচরে এসে ভিনধর্মের নাম নিয়েছিল, সেটাও পরিষ্কার নয়। নিজেকে লুকোনোর জন্য! অমৃতা যদি পুলিশকে ওর বিশ বছর আগের পরিচয়টা দিত, তা হলেই কি মানুষটার শিকড়ের সন্ধান পাওয়া যেত? বোধহয় না। বরং অমৃতার সঙ্গে কয়েক মাসের অবৈধ সম্পর্কটা নিয়ে অযথা জলঘোলা হত। মিডিয়াগুলো মুখরোচক মশলা পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং সবচেয়ে বড় কথা, মেয়ের কাছে সারাজীবনের মতো মায়ের মাথা হেঁট হয়ে যেত।

সদানন্দ বিশলাখিতে এসেও স্বীকার করল, বাস্তবতার খাতিরে অমৃতা পুলিশকে এড়িয়ে এসে বিচক্ষণতার পরিচয়ই দিয়েছে। তা হলে আর তাড়াহুড়ো করে অতদূরে সে গিয়েছিল কেন?

অমৃতা বলল, পারলাম না। কৌতূহলটা কিছুতেই চেপে রাখা গেল না। পুরো নিশ্চিত হওয়ার জন্যই একবার নিজের চোখে দেখতে চেয়েছিলাম মুখখানা। আমার একটা শঙ্কা ছিল, ফের কখনও ওর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে আমার এখনকার জীবনে যদি নতুন জটিলতা দেখা দেয়। আজ অন্তত এটা বুঝতে পারছি, আমার সেই সাময়িক মোহের পর্বটা চিরকালের জন্যে ঢুকে গেল। যাক। মেয়ে বড় হয়েছে, এখন কিছু ঘটলে ওকে এড়িয়ে তো সেটা সম্ভব নয়।

মেয়ে যে সত্যিই বড় হয়েছে, বোঝা গেল একটু পরেই। কাউকে কিছু না জানিয়ে দুপুর দেড়টা নাগাদ বাড়িতে হাজির টাপুরও। সকাল ন'টার গণদেবতা এক্সপ্রেসে রামপুরহাট হয়ে সোজা আজিমগঞ্জ।

কী ব্যাপার? কালকেই তো দেখা হল? আসতে চাইলে তখনই সঙ্গে আসতে পারত! বিশ্বভারতীতে যে ছুটিছাটা আছে, তার কোনও আভাস দেয়নি আগের দিন।

জানা গেল বৃত্তান্ত। আজ সকালে প্রথম ক্লাসটার পর একটা সেমিনারের জন্য হঠাৎ ছুটি হয়ে গেল। পরদিন শনিবার অত ক্লাসের চাপ নেই। তারপর তো রবিবার। বিশ্বভারতীর নতুন নিয়মে সেদিনও ছুটি। টাপুর হাতে দু'টো হালকা দিন পেয়ে ভাবল, বাড়িতে কাটিয়ে এলেই তো হয়। একটা চমক দেওয়াও যাবে। মায়ের সঙ্গে তার অনেক কথা জমে আছে।

মেয়েকে দেখে গুমোট পরিবেশটা ফুরফুরে হয়ে গেল হঠাৎ। অমৃতা অনুযোগের সুরে বলল, আসছিস যে, একটু মোবাইলে জানিয়ে দিতে কী হয়?

টাপুর মায়ের গলা জড়িয়ে গালে গাল ঠেকাল, টু গিভ ইউ অল, আ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ। কেমন লাগছে সদানন্দদা?

সদানন্দ মুখে জবাব দিল না, বুকের চাপটা সরিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

টাপুর ফ্রেশ হয়ে নেওয়ার জন্য ভিতরে যেতেই বাকি দু'জন দু'জনের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকল। এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। অঘটনটা নিয়ে আর কোনও আলোচনাই করা যাবে না। এক পরিচিত জনের অস্বাভাবিক এই মৃত্যুর ব্যাপারটা টাপুরকে এখনই বলা যাচ্ছে না। পরিবেশটা নষ্ট হয়ে যাবে। মেয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন তুলবে, একজন ফকির বা বাউল খুন হয়েছে বলে এই পরিবারের অত মাথাব্যথা কিসের!

সদানন্দর অন্য একটা অস্বস্তিও হচ্ছিল। কাল না-হয় সে গিয়েছিল বঙ্কুনির মেয়েকে দেখতে। আজ এখন পর্যন্ত সে বিশলাখিতে থেকে গেল কেন? মেয়ে তো বুঝতেই পারছে না, আজ সে দ্বীপচরের স্কুলে গিয়েছিল কিনা! ভাবতেই পারছে না, মায়ের সঙ্গে দুপুরেই আবার সেখান থেকে ফিরে এসেছে।

অমৃতাও অস্বস্তিটা চেপে রেখেছে। সদানন্দর সঙ্গে একান্তে কথা বললে হয়তো মনের চাপটা একটু কমানো যেত। মেয়ের সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহার করতে হচ্ছে। জোর করে মুখের উপর একটা খুশির মুখোশ চাপিয়ে রাখা। অথচ তারও ভিতরে সেই মানুষটা খুন হয়ে যাওয়ার চাঞ্চল্য এবং বাড়িতে সদানন্দর উপস্থিতির জন্য অস্বস্তিটা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে।

টাপুর বাথরুম থেকে স্নানটান সেরে জামাকাপড় বদলে এসে অমৃতাকে বলল, খুব খিদে পেয়েছে। এসো সবাই বসে পড়ি।

খাওয়া দাওয়া সারতে আজ আড়াইটে বেজে গেল। বকবক করে চলছিল টাপুর। অমৃতা আর সদানন্দ একটু চুপচাপ, এখনও স্বচ্ছন্দ হতে পারছে না।

ডাইনিং টেবিল থেকে উঠে টাপুর মাকে বলল, রোদ তো পড়ে আসছে, পিছনের বাগান থেকে একটু ঘুরে আসি মা? দেখি, লিচু আম কেমন পাকল!

অমৃতার সস্নেহ আপত্তি, এতটা জার্নি করে এলি, একটু রেস্ট নে না!

- দুৎ, কিচ্ছু দরকার নেই। সদানন্দদা, তুমি কি যাবে সঙ্গে? পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাগান, তাও মায়ের ভয়। চলো, সন্ধে হলেই দেখবে কী সুন্দর চাঁদ উঠবে। (ক্রমশ)

অঙ্কন ঃ সোমনাথ

বাড়িতে পৌঁছেও দু'জনের মুখে বিশেষ কথা নেই। কেমন যেন হতভম্ব হয়ে পড়েছে ঘটনার আকস্মিকতায়। সদানন্দ এ সময় সঙ্গে না থাকলে অমৃতা হয়তো ভেঙেই পড়ত। যে মানুষটার খোঁজ ছিল না উনিশ বছর, তাকে দেখে এল লাশকাটা ঘরে। একেবারে মার্ডার

রসেবশে

হায় রে ইলিশ

হিমি মিত্র রায়

নিমন্ত্রণটা একরকম যেচে নেওয়া। বন্ধুর বাড়িতে পাত পেড়ে খাওয়ার মজাই আলাদা। রবিবার দিন বৃষ্টি মাথায় নিয়ে চলে গেলাম ওর বাড়ি, সকাল থেকে অপেক্ষা করে ছিলাম কতক্ষণে দুই বান্ধবী একসঙ্গে ওর বাড়িতে বসে গল্প করতে করতে খাব। ফোনে শুনে নিয়েছি মেনুতে আমার প্রিয় ইলিশ মাছ আছে, ব্রেকফাস্ট ট্রেকফাস্ট ভুলে গেলাম জাস্ট। মা তো রেগে অস্থির, বাবাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'আমার রান্না কি এতই খারাপ যে তোমার মেয়ে সকাল থেকে শুধু দু'খানা বিস্কুট খেয়ে রয়েছে, বন্ধুর বাড়িতে ইলিশ মাছ খাবে বলে! আমরা কি ওকে ইলিশ মাছ খাওয়াতে পারি না? নাকি আমি খুব খারাপ রান্না করি!'

যাই হোক, চলে গেলাম বন্ধুর বাড়ি। গিয়েই জড়াজড়ি করে আনন্দ উচ্ছ্বাসের প্লাবন। মনে হল কত যুগ পর দেখা হচ্ছে। মা আবার এক টিফিন বক্স পায়েস পাঠিয়ে দিল ওদের জন্যে, বলল, 'আপনি তো আবার মিষ্টি জিনিস খান না, ওদেরকে দেবেন, কেমন?' পরে হেসে বলল, 'যা নেমন্তন্ন খেয়ে আয়।'

কাকিমা হেসে জড়িয়ে ধরল যাওয়া মাত্রই, 'আয়, তোরা গল্প কর, আমি গরম গরম ফ্রায়েড রাইসটা নামিয়েই খেতে ডাকছি।' আহা, বৃষ্টির দিনে ইলিশ মাছের টেস্টই আলাদা হয়ে যায়, সঙ্গে ফ্রায়েড রাইসও আমার প্রিয়। সঙ্গে নিশ্চয়ই চিকেন বা মাটন থাকবে!

যথারীতি খাওয়ার ডাক পড়ল। ওদের বাড়িতে সবাই ভিতরের বাঁধানো উঠোনের পাশে বারান্দায় মাটিতে বসে পাত পেড়ে খায়। সব বাটিতে বাটিতে বেড়ে রাখা। নীচে বসে কাকিমা, আর ছোট একটা পিঁড়িতে বসে ঠাকুমা পাখা হাতে তদারকি করছেন। 'দাও দাও বউমা, শিগগিরি দাও, অগো খুব খিদা পাইসে মনে হইতাসে, মুখখান কেমন যেন শুকায়ে গ্যাসে! আন আন!'

মুখে কিছু বলছি না কিন্তু ব্যাপারটা তো সত্যি, আমি তো সকাল থেকে দু'টো বিস্কুট ছাড়া কিছুই খাইনি। আসনে বসে পড়লাম, আমরা দু'জন। কাকু বারান্দায় চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছেন মন দিয়ে, বেশ গম্ভীর মানুষ উনি।

শেষমেশ খাওয়া পাতে পড়ল। গরম গরম ভাত, ডাল আলুভাজা দিয়ে শুরু। হামলে পড়ে খেতে শুরু করলাম। কিন্তু ডালটা ঠিক কী বস্তু বুঝতে পারলাম না, অবশ্য ডালের মতোই তো লাগছে দেখতে। টুক্কী মানে আমার বন্ধু দেখি নিজের খাওয়া বাদ দিয়ে আমাকে দেখে চলেছে, কী ব্যাপার বুঝলাম না। যাই হোক এটা হয়তো অন্য কোনও ডাল, যা আগে কখনও আমি খাইনি, কতই তো ডাল রয়েছে, আমি তো শুধু তখন মুসুর আর মুগ ডাল বুঝি। তবে খুব একটা ভালো লাগল না খেয়ে, মনে হল জলের মধ্যে দু'-একটা ডালের দানা ভাসছে, বাকিগুলো সেদ্ধ হতে গিয়েও কী বিশেষ কারণে হয়ে উঠতে পারেনি। মুখ বুজে খেয়ে নিলাম, আলু ভাজাটাও কেমন যেন অদ্ভুত টেস্ট। জিভটা সাপোর্ট করল না একে। যাক গে, ইলিশ মাছটাই হল গিয়ে শো স্টপার, ওটা থাকলেই বাকি সব জিরো।

সেই সুখ মুহূর্ত চলে এল। জামবাটিতে উঁচু হয়ে থাকা মাছের ডিমভর্তি ঝোল। কালোজিরে কাঁচালঙ্কা দিয়ে যা আমার খুব প্রিয়, সঙ্গে আরও একটা চাক চাক করে কাটা কোনও ভাসমান বস্তু। ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার ওপর।

অতি সন্তর্পণে ভাতে লেপটে, আনন্দে বুজে আসা চোখকে খুলিয়ে কাঁটা বেছে এক গরাস মুখে পুরলাম। আরামে চোখ বন্ধ হয়ে যেতে গিয়েও এক ঝটকায় বাস্তবে ফিরিয়ে আনল সেই ঝোল। এক ধাক্কা দিল আমার জিহ্বার স্বাদকোরকগুলোয়। তারাও বোধহয় ঠিক ঠাহর করতে পারল না যে ইলিশ মাছের ঝোলের নামে কী তরল পদার্থ মুখে ঢালা হল। ঝোলটা গিলতে না পেরে একবার এই গাল একবার ওই গালে চালানোর চেষ্টা করি। শেষে কোঁত করে গিলে ফেলি ওই অখাদ্য নুন হলুদের জলকে। উফ!

এতক্ষণে আমি আমার প্রিয় বন্ধুর আমার দিকে করুণ চোখে তাকানোর কারণটা বুঝতে পারলাম। টের পেলাম আমি যেচে নেমন্তন্ন নেওয়া সত্ত্বেও কেন সে খুব একটা উৎসাহ দেখায়নি। আহা রে, দিনের পর দিন এমন অখাদ্য বস্তু গিলতে হয় ওকে। এ কী খেতে দিলে কাকিমা, ইলিশ মাছের নামে!

ভগবান! আর এক গরাসও আমার গলা দিয়ে নামবে না, উল্টে খেতে গেলে বমিটমি হয়ে যেতে পারে যে কোনও সময়। হাতে ভাত নিয়ে ক্রমাগত নাড়াচাড়া করে চলেছি। এমতাবস্থায় গরম গরম ফ্রায়েড রাইস হাজির হয়ে গেল। ওমা! এ তো ফ্রায়েড রাইস নয়, এতো বয়েলড রাইস! তার মাঝে কয়েকটা গাজর আর কড়াইশুঁটি উঁকি মারছে! ওয়াক আসতে গিয়েও আটকে নিলাম নিজেকে, ঝরঝরে সরু চালের ভাতের নামে সামনে উপস্থিত ভ্যাটভ্যাটে গলে যাওয়া সেদ্ধ ভাত! আর এটাই আমাকে এখন খেতে হবে! কে আছ বাঁচাও আমাকে!

মনে হচ্ছে মায়ের দেওয়া টিফিন বক্সটা কেড়ে নিয়ে পায়েসটা খেয়ে ফেলে মুখটা মেরামত করি। কিন্তু তা হল না। আমাকে সবকিছু খেয়েই ওদের বাড়ি থেকে আসতে হল। আর মাটনের কথা নাই বা লিখলাম।

অঙ্কন ঃ অভি